

প্রাণের সন্ধানে খুঁজিছে প্রাণ মম!

(অভিজিত রায় এবং ফরিদ আহমেদের লেখা *প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমার প্রাণে* গ্রন্থের রিভিউ)

-বিপ্লব

Throughout these infinite orbs of mingling light,
Of which yon earth is one, is wide diffused
A Spirit of activity and life,
That knows no term, cessation, or decay.-P B Shelley (Queen Mab, 1813)

(অসীম বিদীর্ণ পরিব্যাপ্ত আলোকসজ্জা

যে অনন্তের অনুপ্রাণ ধরিত্রীর বুকে

প্রাণের স্পন্দনে জেগে ওঠা প্রাণ

অনাদি, অনন্ত ... আবহমান।)

রোববার সকালে এই মুহূর্তে আমার অস্তিত্বটা বিচ্ছিন্ন। আমি মানে- পিতা, পুত্র, স্বামী, বাঙালী, ভারতীয়, আমেরিকান, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক সবাইকে শ্বশানে পুড়িয়ে ভেবে চলেছি এই মহাবিশ্বের চোখে আমি কে? এ প্রশ্ন আদি অনন্তকালের। আমি নিশ্চিত উদরপূর্তি অন্তে প্রতিটা পশুই চিন্তা করে সে কে! সেই মিশরীয় সভ্যতা থেকে যাবতীয় মানবিক অনুসন্ধিৎসা-উপনিষদ, গীতা, কোরান, বাইবেল ইত্যাদি সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে যদি কেও এক কথায় প্রকাশ করতে বলে— আমি বলবো সবই 'আমি' নামে এই সত্ত্বার অনুসন্ধান। তবে সেই যুগের চেয়ে আমার হাতে এখন অনেক বেশী তথ্য-আমি আমার জৈবরাসায়নিক সত্ত্বাকে জানি। আরো জানি মহাবিশ্বের উৎপত্তির সাথে কি ভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে মানুষ নামের এই অদ্ভুত জীবটি। যেক্ষণে আমার চেতনার র্যাডারে উদ্ভাসিত এই হাজার কোটি বছরের বেঁচে থাকা মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোণে পৃথিবীর বুকে এক ক্ষুদ্রতম স্থান দখল করে কয়েক সেকেন্ড বা তার চেয়েও ক্ষণজন্মা মানুষ হচ্ছে 'আমি'-স্থান কালের এই অসীম বিহ্বলতা আর মহানুভবতার ব্যাপ্তিতে বিদীর্ণ হয় আমার অহংকার- সম্পূর্ণ হয় নগণ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ 'আমি' সত্ত্বার আত্মসমর্পণ। বিজ্ঞান এবং ধর্মের এক ক্রান্তিমিলন অনুভব করি মহাবিশ্বের রহস্যময় বিশালতার কাছে 'আমি' সত্ত্বার আত্মসমর্পণে।

অভিজিত রায় এবং ফরিদ আহমেদের লেখা *প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমার প্রাণে* বাংলাগদ্য সাহিত্যে চমকপ্রদ সংযোজন। যারা এই মানব সত্ত্বাকে বিজ্ঞানচক্ষুতে বিশ্লেষণ করে, সেই আদি-অনাদি প্রশ্নের উৎসমুখে, যুক্তিবাদি চেতনার বারিধারায় সিক্ত হতে চান, তাদের জন্য অভিনব এবং তথ্যবহুল উপস্থাপনা অভিজিত আর ফরিদের।

প্রথম অধ্যায় প্রাণের ভাববাদি বনাম বস্তুবাদি ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। লেখক ব্যাখ্যা করেছেন প্রাণ এবং আত্মনের সন্ধানে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের যাত্রা। রমন লাম্বার মৃত্যু থেকে জেমিফক্সের জীবনপ্রাপ্তি-ইত্যাদি অসংখ্য জনপ্রিয় উদাহরণের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় প্রাণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার গুরুত্ব এবং ব্যাপ্তি। সাথে

সাথে সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে প্রাণের জৈবিক, তথা জৈবরাসায়নিক ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপস্থাপনা জীবনের জৈবরাসায়নিক ভিত্তি। কি সেই সাধারণ ভিত্তি বা নির্ণায়ক যার নিঞ্জিতে ভাইরাস এবং আমার-দুজনেরই প্রাণ আছে! এমিব্যা এবং আমি, উভয়েই প্রাণী! জীবের জৈবরাসায়নিক স্বরূপ উন্মোচনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস প্রাঞ্জল ভাষায় মূর্ত প্রতিটা শব্দে। শেষে যুক্তির সিঁড়িভাঙা গদ্যে প্রাণের উপসংহার-প্রাণরূপ আত্মনের সত্ত্বা হচ্ছে প্রতিলিপি বানানো (রেপ্লিকেশন) এবং কার্যকরী মিউটেশনের মাধ্যমে এই পরিবেশের আরো উপযোগী, সফল ভাবে বেঁচে থাকা উত্তরাধিকারীর জন্মদান। যার পোষাকি নাম ডারউইনিয়ান বিবর্তন।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পাচ্ছি প্রাণের উদ্ভবের জৈব তথা জৈবরাসায়নিক ইতিহাস। কেমন করে ধরিত্রীর বুকে সৃষ্ট হলো এই জৈবরাসায়নিক প্রাণ? কাদের অক্লান্ত গবেষণায় আজ আমরা জেনেছি, অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ এবং জৈব যৌগ থেকে প্রাণ-প্রোটিনের উদ্ভবের কথা? প্রাণের উৎপত্তির ওপর যাবতীয় নব্য এবং ঐতিহাসিক গবেষণার ডালি নিয়ে হাজির তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়। লুই পাস্তুর থেকে ওপারিন হ্যালডেন, সেখান থেকে উরি মিলারের যুগান্তকারী পরীক্ষার মাধ্যমে এমাইনো এসিড তৈরী-প্রাণকে জানার জন্য মানুষের অনুসন্ধিৎসার বৈজ্ঞানিক অভিযান। এর লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পাঠকের কৌতুহলী মনকলস পূর্ণ হবে আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর গদ্যে এবং তথ্যবহুল অথচ সুলালিত ভাষার চমৎকারিত্বে।

পঞ্চম অধ্যায়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ-এখানে আমরা জানছি উরি-মিলারের পরীক্ষার পর, সিডনি ফক্সের গবেষণা। কি করে প্রোটিন থেকে জীবন সাদৃশ প্রোটিন এবং প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্পিয়ারের জন্ম হলো এই পৃথিবীতে। ক্রমশ উৎপত্তি ভিরয়ডস -এবং প্রিয়নের। এরা প্রাণ এবং জড়ের সীমান্ত নাগরিক। তাই প্রাণের অনুধাবনে এদের জৈবরাসায়নিক সত্ত্বাকে বোঝা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই আমরা জানছি কি ভাবে আন্তে আন্তে ঢুকলো নিউক্লিও এসিড কোড-যেদিন ওই কোড সংযোজিত হলো আদিম মাইক্রোস্পিয়ারের মধ্যে, পৃথিবীর বুকে বিবর্তনের পথে প্রতিষ্ঠা হলো প্রাণের। এ অধ্যায়ে আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি সরল জেনেটিক ডি এন এ থেকে আন্তে আন্তে জটিল ডি এন এ, অর্থাৎ আরো জটিল প্রাণ সৃষ্টির বিজ্ঞানগাথা।

প্রাণ যদি কোন ঈশ্বর ছাড়াই এত স্বতস্ফূর্ত ভাবে ভূমিষ্ঠ হতে পারে, এই মহাবিশ্বে পৃথিবীর বাইরেরও পাওয়া সম্ভব প্রাণের সন্ধান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফরিদ আহমেদ লিখছেন এই সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান মানুষের কৌতুহলী গবেষণা। যে কল্পনায় জুলে ভার্ন থেকে শুরু করে লেখা হয়েছে হাজার হাজার কল্পবিজ্ঞান। কিন্তু এই অধ্যায় কল্পবিজ্ঞান না-সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান বৈজ্ঞানিক পদাবলি। মঞ্জাল, বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপা এবং শনির চাঁদ টাইটানকে ঘিরে আমাদের আশা ভরসা ছিল সব থেকে বেশী। সৌরসংসারে একাকীত্বের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য, প্রতিবেশীর সন্ধান ভয়েজার, পায়োনীর, ক্যাসিনি থেকে হাবল টেলিস্কোপের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার গল্প বলেছেন ফরিদ। অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং নিখুঁত এই লেখা।

সপ্তম অধ্যায় প্রাণের সৃষ্টিতে প্যানসপারমিয়া তত্ত্বের। পৃথিবীর বুকে ধাক্কা খাওয়া এস্টারয়েড এবং ধুমকেতুর অনেকেই সমৃদ্ধ মিথেন, ইথেন ইত্যাদি জৈবানুতে। এরাই কি একদিন পৃথিবীতে বয়ে এনেছিল প্রাণ? রোপন করেছিল সভ্যতার জয়যাত্রা? সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে এনেছেন ফরিদ আহমেদ। পঞ্চম খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক এনার্সেগোরাসের চিন্তা যে ধারণার ধাত্রীগৃহ, তার

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন গত শতাব্দীতে - হেলমোজ, আরেহেনিয়াস থেকে এই চিন্তাকে টেনে বিজ্ঞানের পায়ে দাঁড় করান ফ্রেড হ্যেল এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী চন্দ্রবিক্রমসিংহে।

বহির্বিশ্বে প্রাণের উদ্ভব-এহেন ধারণার পেছনে মূল কারণ, প্রাণের বয়স নিয়ে সংশয়। চন্দ্র যখন তৈরী হলো, এটা ধরে নেওয়া যায়, তখন পৃথিবীর বুকে আবহাওয়া থাকলেও তা প্রাণের অনুকূল ছিলো না। সমস্যা হচ্ছে প্রাণের বিবর্তন জৈবরাসায়নিক মানতে গেলে, আদি প্রোটিন ফসিলের বয়স অনুযায়ী এটাও মানতে হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে বেশ দ্রুত-যখনও হয়তো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলও তৈরী হয় নি! এবং চাঁদ তৈরী হওয়ার সময়ও অক্ষত ছিল সেই প্রাণ। যা প্রায় অসম্ভব। অনেকেই মনে করেন প্রাণের বয়স প্রায় ৯ বিলিয়ান বছর, যেখানে পৃথিবীর বয়স মোটে ৪-৫ বিলিয়ান। এর মধ্যে চাঁদ তৈরী হওয়ার পর শেষ তিন বিলিয়ান বছরে প্রায় ধারাবাহিক ভাবে পৃথিবী প্রাণের যোগ্য। অন্যদিকে নানা পরীক্ষায় এটা প্রমানিত সত্য ব্যাকটেরিয়া মহাশূন্য এবং চাঁদে সময় কাটিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে বেঁচে উঠতে পারে। অর্থাৎ লম্বা মহাজাগতিক পরিক্রমানে পাড়ি দিয়েও তাদের কেও কেও বেঁচে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশবিস্তারে সক্ষম হয় আবার।

এই নিয়ে সবচেয়ে বেশী হইচই কেরালায় লাল বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। বৃষ্টির মধ্যে লাল এককোষি জীবেদের সন্ধান পাওয়া যায় ২০০৩ সালে- ছমাস আগে ২০০৬ এর এপ্রিল মাসের এক গবেষণা পত্রে গফ্রে লুইস নামে এক বিজ্ঞানী এদেরকে বহির্বিশ্বের বলে দাবি করেন। কারণ তারা ১৩০ সেন্টিগ্রেড ফুটন্ত জলেও বেঁচে থাকে যা ইহজগতের কোন জীবানু পারে না। তবে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারালিকার হায়দ্রাবাদে একই ধরনের লাল মেঘের ওপর (মাটি থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে) পরীক্ষা চালিয়ে ব্যাসিলাস সিম্প্লেক্স এবং স্টেফাইলো কক্কাসের সন্ধান পান। যা পৃথিবীরই জীবানু! সুতরাং -১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রাণের বেঁচে থাকাটাও অবাধ করা ব্যাপার। যাইহোক দাবি এবং পালটা দাবি নিয়ে জমে উঠেছে পানসপারমিয়া তত্ত্ব। আশা করা যায় লেখক তার এই চ্যাপ্টারটি খুব শীঘ্রই নতুন দাবিগুলির আলোকে লিখবেন। খুবই আনন্দের কথা ভারতের বিজ্ঞানীরা এর ওপর প্রচুর গবেষণা করছেন। কারণ ভারতের ওপরেই এই ধরনের মেঘের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অষ্টম অধ্যায় ডেকের সমীকরণ নিয়ে। যা মহাবিশ্বে কতগুলি গ্রহে প্রাণ থাকতে পারে বা উন্নতবুদ্ধির জীব থাকতে পারে, তার একটা স্থূল মান। অনেক বিজ্ঞানীই এটা মানেন না। ডেকের সমীকরণ প্রথম শূনি বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু রায়চৌধুরীর মুখে। আমি তখন নরেন্দ্রপুরে একাদশশ্রেণীর ছাত্র-উনি টানা দুঘন্টা লেকচার দিয়েছিলেন ডেকের সমীকরণের ওপরে। মহাবিশ্বে প্রাণের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনায় দুলে উঠেছিল মন। ডেকের সমীকরণ থেকে প্রাপ্তি মহাবিশ্বের অন্য সৌরমন্ডলীতে প্রাণের উদ্ভবের সম্ভাবনা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত। উনার সমীকরণ অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়-যতটা সমীকরণ গঠন করার মেথোডোলজীটা। এই অধ্যায়েও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় মনোময় নির্মলতা এবং ক্রটিহীন উপস্থাপন বিশেষভাবে দৃষ্ট।

শেষ অধ্যায় মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার সন্ধানে রেডিও তরঙ্গের প্রয়োগ। নাসা থেকে শুরু করে বিশ্বের যাবতীয় শৌখিন এবং পেশাদারি বিজ্ঞানীরা মহাকাশ থেকে আগত রেডিও সিগন্যাল বিশ্লেষণ করছেন এবং পালটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন অন্য মহাবিশ্বের দিকে যদি তারা আমাদের রেডিও ভাষা উদ্ধারে সক্ষম হয়। এই বিপুল কর্মযজ্ঞ কি ভাবে সংগঠিত হচ্ছে-আপনিও কি ভাবে এতে অংশ নিতে পারেন-এই নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা। বস্তুত রেডিও টেলিস্কোপ মহাকাশ বিজ্ঞান বদলে দিয়েছে এফোঁর-ওফোঁর করে।

পরিশেষে বলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থ। শুধু একটা ফাঁক নিয়ে না বললেই না। আশা করবো লেখকবৃন্দ পরের গ্রন্থ প্রকাশে জৈবরাসায়নিক বিবর্তন থেকে 'মানব চেতনা'র উদ্ভব নিয়ে লিখবেন। চেতনা বা কনসায়েন্স কি, এটা জানা জরুরী-'আমি' সত্ত্বার বিশ্লেষণে। কোয়ান্টাম বাস্তবতার সাথে তথ্যবিজ্ঞান এবং জৈবরাসায়নের ত্রিবেণী সঙ্গমে তৈরী জৈব মানবের উচ্চতর কাঠামো তথ্যমানব। পরের সংস্করণে এই অভাব পূরন হবে-আশা রাখি।

ক্যালিফোর্নিয়া ১১/২০/০৬

[লেখক পেশায় আলোকপ্রযুক্তিবিদ এবং ভিন্নমতের (www.vinnomot.com) ওয়েব এডিশনের সম্পাদক। যোগাযোগ-biplabpal2000@yahoo.com]